[illegible]

[illegible] (Conflict of Interest) [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

পরিষদে সপ্তাহে মাত্র ১-২ দিন আসায় নাগরিক সেবা পেতে জনগণকে চেয়ারম্যানের ‘নিজস্ব অফিসে’ গিয়ে হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে।

চরম অব্যবস্থাপনার জবাবে অভিযুক্তের বক্তব্য আরও হতাশাজনক। “সারাদেশে এমন অনেকেই আছেন”—এই খোঁড়া যুক্তি দিয়ে তিনি নিজের অপরাধকে বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করছেন। অনিয়ম কখনো অন্য কারো অনুসরণের মাধ্যমে নিয়ম হয়ে যেতে পারে না।

এক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসনের উদাসীনতাও প্রশ্নবিদ্ধ। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বা জেলা রেজিস্ট্রারের মতো দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা এতদিন ধরে এই ‘ওপেন সিক্রেট’ বিষয়টি জানতেন না বলে যে দাবি করেছেন, তা তাদের তদারকির দুর্বলতাকেই প্রকাশ করে। তবে আশার কথা হলো, স্থানীয় সরকার বিভাগ ও জেলা রেজিস্ট্রার তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।

এ ঘটনা একজন মু. আলম হুসাইনের একক অপরাধ নয়, এটি আমাদের জবাবদিহিতাহীন ব্যবস্থার একটি প্রতীকী চিত্র। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং করদাতার টাকার সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে এই ত্রিমুখী আর্থিক সুবিধাভোগীর বিরুদ্ধে দ্রুত তদন্ত সাপেক্ষে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

একই সাথে, অন্য কোথাও এমন ছদ্মবেশী ‘সবজান্তা ও সর্বভুক’ কর্মকর্তা আছেন কি না, তা খুঁজে বের করতে শিক্ষা ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের যৌথ চিরুনি অভিযান চালানো জরুরি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় সরকারকে এভাবে জিম্মি করার অধিকার কারও নেই।

জনপ্রতিনিধিদের নৈতিকতা ও প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলার প্রশ্ন

মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য তাজ উদ্দিন খানের মানিকনগর ডিএস আমিনিয়া আলিম মাদ্রাসার সহকারী মৌলভী পদের বেতন ও ঈদুল আজহার

উৎসব ভাতা বন্ধ করার সিদ্ধান্তটি প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলা ও নৈতিকতার এক অনন্য নজির স্থাপন করেছে। একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গভর্নিং কমিটি ও অধ্যক্ষ এমপিও বিধিমালা অনুযায়ী যে পদক্ষেপ নিয়েছেন, তা যেমন প্রশংসনীয়, তেমনই দেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সংস্কৃতির জন্য একটি বড় ধরনের বার্তা।

খবরে প্রকাশ, সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর থেকেই তিনি খাতা- কলমে শিক্ষক পদে বহাল থাকলেও মাদ্রাসায় নিয়মিত উপস্থিত ছিলেন না। এমনকি তাঁর অনুপস্থিতিতে অন্য কারও মাধ্যমে বেতন শিটে স্বাক্ষর করিয়ে রাষ্ট্রীয় কোষাগার বা এমপিওভুক্ত তহবিল থেকে সুবিধা গ্রহণের মতো অনৈতিক অভিযোগও উঠেছে। একজন শিক্ষক যখন দেশের আইনপ্রণেতা বা সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন, তখন তাঁর কাঁধে জাতীয় ও আঞ্চলিক দায়িত্ব অর্পিত হয়। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ফোরামে ভূমিকা রাখার পাশাপাশি নিজ এলাকার লক্ষ লক্ষ মানুষের সুখে-দুঃখে পাশে থাকা তাঁর মূল ব্রত হয়ে দাঁড়ায়। এমন এক মহান দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হওয়ার পরও একটি স্থানীয় মাদ্রাসার সহকারী মৌলভী পদের ক্ষুদ্র সুযোগ-সুবিধা ও ভাতা আঁকড়ে থাকার প্রবণতা চরম নৈতিক স্খলনের শামিল।

সংসদ সদস্য হিসেবে একজন ব্যক্তি রাষ্ট্র থেকে প্রটোকল, বেতন, ভাতা ও অন্যান্য বহুবিধ আকর্ষণীয় সুবিধা পেয়ে থাকেন, যা একজন সাধারণ শিক্ষকের চেয়ে বহুগুণ বেশি। এরপরেও নিয়মবহির্ভূতভাবে মাদ্রাসার চাকরি টিকিয়ে রাখা এবং বিনা ছুটিতে বা ছদ্ম-উপস্থিতির মাধ্যমে সুবিধা নেওয়া কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। এটি কেবল ওই মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের শিক্ষার অধিকারকেই ক্ষুণ্ন করেনি, বরং প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ও প্রশাসনিক শৃঙ্খলাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে।

দেরিতে হলেও মাদ্রাসার গভর্নিং কমিটি ও অধ্যক্ষ বিধি মোতাবেক এমপি মহোদয়ের বেতন-ভাতা বন্ধের যে সাহসী ও নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তা দেশের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের জন্যও অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হতে পারে। আইন সবার জন্য সমান—এই বাক্যটি যে শুধু কাগজে-কলমে নয়, বাস্তবেও প্রয়োগ করা সম্ভব, মানিকনগর মাদ্রাসার এই পদক্ষেপ তা প্রমাণ করে। ক্ষমতার দাপটে প্রতিষ্ঠানের নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখানোর যে অপসংস্কৃতি আমাদের সমাজে জেঁকে বসেছে, তা ভাঙার জন্য এমন পদক্ষেপ অত্যন্ত জরুরি ছিল।

আশা করি, সংশ্লিষ্ট মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে শিক্ষা

অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বরাবর যে চিঠি পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সেখান থেকে দ্রুত ও আইনানুগ নির্দেশনা আসবে। একই সাথে, মাননীয় সংসদ সদস্যও নিজের ভুল অনুধাবন করে নৈতিক অবস্থান থেকে মাদ্রাসার চাকরি থেকে স্থায়ীভাবে অব্যাহতি নেবেন এবং নিজেকে পূর্ণাঙ্গভাবে জনগণের সেবায় নিয়োজিত করবেন। জনপ্রতিনিধিদের আচরণ ও সততা হওয়া উচিত প্রশ্নাতীত, কারণ তাঁদের দিকেই তাকিয়ে থাকে পুরো সমাজ ও আগামী প্রজন্ম।

গণপিটুনি: আইনের শাসনের জন্য এক বিপজ্জনক সংকেত

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামন্দীতে টায়ার চুরির অভিযোগে এক যুবকের গণপিটুনিতে নিহত হওয়ার ঘটনা আবারও আমাদের সামনে একটি উদ্বেগজনক বাস্তবতা তুলে ধরেছে। নিহত আসাদুল আরিফের বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ থাকলেও, কোনো সভ্য ও আইনের শাসনভিত্তিক সমাজে কাউকে বিচারবহির্ভূতভাবে হত্যা করার অধিকার জনগণের নেই। অপরাধের অভিযোগ এবং অপরাধ প্রমাণিত হওয়া এক বিষয় নয়; আর বিচার করার দায়িত্ব জনগণের নয়, রাষ্ট্রের আইন ও বিচারব্যবস্থার।

সংবাদে জানা যায়, চুরির সময় স্থানীয়দের হাতে ধরা পড়ার পর ওই যুবককে বেঁধে রেখে মারধর করা হয়। পরবর্তীতে গুরুতর আহত অবস্থায় তিনি মারা যান। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, তাকে জিজ্ঞাসাবাদও করা হয়েছে। এটি কেবল একজন মানুষের মৃত্যুর ঘটনা নয়; এটি আইনের শাসনের প্রতি এক ধরনের চ্যালেঞ্জ এবং বিচারব্যবস্থার ওপর অনাস্থার বহিঃপ্রকাশ।

দেশে গণপিটুনির ঘটনা নতুন নয়। বিভিন্ন সময় চোর সন্দেহে, ছেলেধরা গুজবে কিংবা অন্যান্য অভিযোগে মানুষকে পিটিয়ে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, জনতার আবেগ, ক্ষোভ কিংবা তাৎক্ষণিক প্রতিশোধস্পৃহা আইনের সীমা অতিক্রম করে ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনে। কিন্তু এ ধরনের কর্মকাণ্ড সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে না; বরং আরও বিশৃঙ্খলা ও সহিংসতার সংস্কৃতি তৈরি করে।

যদি কেউ অপরাধ করে থাকে, তাহলে তাকে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে সোপর্দ করা উচিত। আদালত প্রমাণ ও সাক্ষ্যের ভিত্তিতে তার অপরাধ নির্ধারণ করবে এবং প্রয়োজনীয় শাস্তি দেবে। গণপিটুনি এই পুরো বিচারিক প্রক্রিয়াকে অস্বীকার করে এবং নিরপরাধ ব্যক্তিও এর শিকার হতে পারেন। অতীতে এমন বহু উদাহরণ রয়েছে, যেখানে ভুল সন্দেহের কারণে নিরীহ মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন।

গাংনী থানা পুলিশ ইতোমধ্যে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং জড়িতদের শনাক্ত করার চেষ্টা করছে। এটি ইতিবাচক উদ্যোগ। তবে শুধু তদন্ত করলেই হবে না; যারা এই হত্যাকাণ্ডে অংশ নিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। একই সঙ্গে জনগণের মধ্যে আইনি সচেতনতা বৃদ্ধি এবং গণপিটুনির বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলাও জরুরি।

একটি সভ্য রাষ্ট্রে বিচার আদালতে হয়, জনতার হাতে নয়। গাংনীর এই মর্মান্তিক ঘটনা আমাদের আবারও স্মরণ করিয়ে দেয়—আইনের শাসন দুর্বল হলে সমাজে ন্যায়বিচারের পরিবর্তে প্রতিশোধের সংস্কৃতি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। সেই সংস্কৃতি রোধ করা এখন রাষ্ট্র ও সমাজ উভয়েরই দায়িত্ব।

জোড়াতালি ও অবহেলার বৃত্ত থেকে মুক্তি কবে?

জেলার সর্বোচ্চ চিকিৎসাসেবা কেন্দ্র যখন নিজেই তীব্র ‘রোগাক্রান্ত’ হয়ে পড়ে, তখন সাধারণ মানুষের চিকিৎসাপ্রাপ্তির অধিকার যে কতটা বিপন্ন হতে পারে, তার এক নির্মম বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালের বর্তমান পরিস্থিতিতে।

গতকাল মঙ্গলবার মেহেরপুর প্রতিদিনের প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, হাসপাতালটিতে প্রতিদিন গড়ে চার শতাধিক রোগী চিকিৎসাধীন থাকছেন, যাদের অধিকাংশেরই প্রধান উপসর্গ জ্বর, তীব্র শ্বাসকষ্ট ও অন্যান্য ঋতুপরিবর্তনজনিত রোগ। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, ২৫০

শয্যার এই প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আড়ালে লুকিয়ে আছে অত্যন্ত দুর্বল ও অপ্রতুল এক স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা। হাসপাতালটি কাগজে-কলমে ২৫০ শয্যার হলেও এখনো চলছে মাত্র ১০০ শয্যার পুরোনো জনবল কাঠামো দিয়ে, যা জেলার সামগ্রিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার চরম সমন্বয়হীনতা এবং প্রশাসনিক উদাসীনতারই নগ্ন বহিঃপ্রকাশ।

সরকারি নথিপত্রে এই হাসপাতালটিকে বড় আকারে উন্নীত করা হলেও বাস্তবে তার কোনো সুফল মেহেরপুরের সাধারণ মানুষ পাচ্ছে না।

যেখানে শয্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে আনুপাতিক হারে জনবল, ওষুধ এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পাওয়ার কথা, সেখানে হাসপাতালটি চলছে জোড়াতালি দিয়ে। ১০০ শয্যার কাঠামো অনুযায়ী যেখানে ৪১টি চিকিৎসকের পদ রয়েছে, সেখানে কর্মরত আছেন মাত্র ২৯ জন।

সবচেয়ে আশঙ্কাজনক বিষয় হলো, হাসপাতালের অতি গুরুত্বপূর্ণ পদ যেমন সিনিয়র মেডিসিন কনসালটেন্ট দীর্ঘদিন ধরে শূন্য রয়েছে।

তদুপরি, একজন মাত্র অ্যানেসথেসিস্ট ছিলেন, তাকেও জরুরিভাবে বদলি করায় বর্তমানে হাসপাতালের মেজর অপারেশনগুলো সম্পূর্ণ বন্ধ রয়েছে। একটি আধুনিক জেলা হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটার বন্ধ থাকা অত্যন্ত দুঃখজনক। হাসপাতালের আধুনিক ৫ শয্যার আইসিইউ ওয়ার্ড থাকলেও ডেডেকেটেড জনবলের অভাবে কাঙ্খিত সেবা মিলছে না। ৩টি জীবনরক্ষাকারী অ্যাম্বুলেন্সের বিপরীতে চালক আছেন মাত্র ১ জন।

এই চরম অব্যবস্থাপনার কারণে হাসপাতালের মেঝে ও বারান্দায় তিল ধারণের ঠাঁই নেই; শয্যাহীন রোগীদের ভোগান্তি এখন চরমে পৌঁছেছে।

সাম্প্রতিক সময়ে ঋতু পরিবর্তনের ফলে শ্বাসকষ্ট, বুকব্যথা ও পেটের পীড়া নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া রোগীর সংখ্যা বহুগুণ বেড়েছে। বিশেষ করে বয়োজ্যেষ্ঠ এবং ধূমপানে আসক্ত ব্যক্তিরা এই শ্বাসকষ্টের প্রধান শিকার হচ্ছেন। এই বিপুল সংখ্যক রোগীর বিপরীতে হাসপাতালে কর্মরত নার্স ও চিকিৎসকরা সাধ্যমতো চেষ্টা করলেও, এই অপ্রতুল জনবল নিয়ে মানসম্মত ও মানবিক সেবা নিশ্চিত করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। চিকিৎসকের অভাবের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত ও সেবামূলক সহায়তার অভাব রোগীদের জীবনকে দিন দিন আরও বেশি ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলছে।

হাসপাতালের বর্তমান তত্ত্বাবধায়কের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে,

স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সংকটের কথা ঊর্ধ্বতন মহলকে একাধিকবার লিখিত ও মৌখিকভাবে জানালেও দৃশ্যমান কোনো সমাধান আসেনি। বরং সংকট আরও ঘনীভূত করে এখান থেকে চিকিৎসক বদলি করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

এই ধরণের বৈষম্যমূলক চিকিৎসকদের বদলি নীতি এবং নতুন পদায়নে অবহেলা প্রান্তিক জনপদের মানুষের প্রতি এক ধরণের চরম অবিচার। ঢাকার বাইরের জেলাগুলোর প্রান্তিক স্বাস্থ্যসেবাকে এভাবে উপেক্ষিত রেখে দেশের সার্বিক স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়ন কখনো সম্ভব নয়।

মেহেরপুরের সাধারণ মানুষের এই তীব্র চিকিৎসাকষ্ট দূর করতে অবিলম্বে জরুরি ও স্থায়ী পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। প্রথমত, হাসপাতালের জন্য ২৫০ শয্যার পূর্ণাঙ্গ জনবল কাঠামো দ্রুত অনুমোদন এবং তা মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়ন করতে হবে। শূন্য পদগুলোতে জরুরি ভিত্তিতে দক্ষ চিকিৎসক ও জনবল নিয়োগ দিতে হবে এবং বন্ধ থাকা অপারেশন থিয়েটার চালু করতে অনতিবিলম্বে অ্যানেসথেসিস্টের পদায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

আইসিইউ-এর মতো জীবনরক্ষাকারী ইউনিটকে ডেডিকেটেড জনবল নিয়োগ করতে হবে। জেলা শহরের এই প্রধান হাসপাতালের সুচিকিৎসা নিশ্চিত করা কোনো দয়া বা করুণা নয়, বরং জনগণের সাংবিধানিক ও মৌলিক অধিকার। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর মেহেরপুরবাসীর এই মানবিক সংকটের গুরুত্ব অনুধাবন করে অবিলম্বে চিকিৎসাসেবা স্বাভাবিক করার কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে—এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

ক্রীড়াচর্চাই হোক যুবসমাজের ঢাল

মাদকের ছোবল, মোবাইল গেম ও জুয়ার আসক্তি ধীরে ধীরে গ্রাস করছে দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে। শহর থেকে গ্রাম — কোথাও এ সমস্যা থেকে মুক্তি নেই। এই প্রেক্ষাপটে ঢাকাস্থ মেহেরপুর জেলা সমিতি এবং মেহেরপুর এমকেএসপির যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত স্টার কাপ ক্রিকেট

টুর্নামেন্ট ২০২৬-এর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বক্তাদের আহ্বান — যুবসমাজকে মাদক ও জুয়া থেকে দূরে রাখতে ক্রীড়াচর্চার প্রসার ঘটাতে হবে — অত্যন্ত সময়োপযোগী এবং তাৎপর্যপূর্ণ।

সুস্থ বিনোদন ও শারীরিক পরিশ্রমের অভাবে তরুণরা অনেক সময় বিপথগামী হয়। মাদক ও জুয়া শুধু একটি ব্যক্তির জীবন নষ্ট করে না, বরং একটি পরিবারকে ভেঙে দেয়, সমাজে অস্থিরতা তৈরি করে এবং দেশের উৎপাদনশীলতাকে দুর্বল করে তোলে। এ সমস্যা কেবল আইন-শৃঙ্খলার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে চলবে না; এর সমাধান খুঁজতে হবে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে।

ক্রীড়াচর্চা এ ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। খেলাধুলা তরুণদের মধ্যে শৃঙ্খলা, দলগত মনোভাব, সহমর্মিতা এবং জয়-পরাজয় মেনে নেওয়ার মানসিকতা গড়ে তোলে। মাঠে ঘাম ঝরানো একটি তরুণকে সন্ধ্যার আঁধারে মাদকের আড্ডা থেকে দূরে রাখতে পারে। তাই স্থানীয় পর্যায়ে এ ধরনের ক্রিকেট, ফুটবল বা অন্যান্য ক্রীড়া টুর্নামেন্ট আয়োজন নিছক বিনোদন নয়, এটি একটি সামাজিক বিনিয়োগ।

তবে শুধু একটি টুর্নামেন্ট দিয়ে এ সমস্যার সমাধান হবে না। প্রতিটি উপজেলায় খেলার মাঠ নিশ্চিত করতে হবে। দখল হয়ে যাওয়া মাঠগুলো উদ্ধার করতে হবে। স্থানীয় প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি এবং সুশীল সমাজকে একযোগে কাজ করতে হবে। ঢাকাস্থ মেহেরপুরবাসীরা নিজ এলাকার উন্নয়নে যেভাবে এগিয়ে আসছেন, সেটি অনুকরণীয়। তাঁদের এই উদ্যোগ অনেক তরুণের হৃদয়ে সঠিক পথে চলার অনুপ্রেরণা জোগাবে।

স্থানীয় প্রশাসনকেও দায়িত্ব নিতে হবে। ক্রীড়া বাজেট বৃদ্ধি, তৃণমূল পর্যায়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক কার্যক্রম আরও জোরদার করা প্রয়োজন। যুবসমাজকে সুস্থ ও সৃজনশীল কাজে নিযুক্ত রাখতে না পারলে মাদক ও জুয়ার বিরুদ্ধে যতই অভিযান চালানো হোক, তা দীর্ঘমেয়াদে ফলদায়ক হবে না।

এ ধরণের মতো আয়োজন যদি সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে, তাহলে একদিন হয়তো ক্রিকেট ব্যাট আর ফুটবলই হবে মাদক ও অন্ধকারের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় প্রতিরোধ।

বিচারপ্রার্থীকে থামানো, বিচারব্যবস্থাকেই আঘাত করার শামিল

মেহেরপুরের গাংনীতে ধর্ষণ মামলার বাদিকে আদালতে যেতে বাঁধা বিএনপির নেতার শিরোনামে মেহেরপুর প্রতিদিনের সংবাদটি দৃষ্টিগোচর হয়েছে। সংবাদটিতে তুলে ধরা হয়েছে, একজন নারীর উপর শারীরিক নির্যাতনের ঘটনা নয়— এটি বিচারপ্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা।

একজন ধর্ষণ মামলার বাদী, যিনি আদালতে হাজিরা দিতে যাচ্ছিলেন, তাঁকে পথেই থামিয়ে দেওয়া হয়েছে— লাঠিসোটা দিয়ে, ভয় দেখিয়ে, দোকানে তালাবদ্ধ করে। এই কাজটি যিনি করেছেন, তিনি নিজেকে আইনের চেয়ে বড় মনে করেন বলেই করেছেন।

অভিযুক্ত নুর ইসলাম খোকন একজন স্থানীয় বিএনপি নেতা। কিন্তু রাজনৈতিক পরিচয়ের আগে তাঁর এই কাজের পরিচয় হলো— তিনি একজন ধর্ষণের আসামির পক্ষে দাঁড়িয়ে ভুক্তভোগীকে নিপীড়ন করেছেন। নিজের মুখেই স্বীকার করেছেন যে তাকে “ডেকে আনা হয়েছিল”— অর্থাৎ এটি পরিকল্পিত। আর সেই পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল একটাই: বিচারকক্ষে পৌঁছানোর আগেই ভুক্তভোগীকে ভেঙে দাও।

আরও উদ্বেগজনক হলো নুর ইসলামের ঔদ্ধত্য। নির্যাতনের পর তিনি বলছেন “সামাজিক সালিসই সঠিক”— যেন ধর্ষণের বিচারও পাড়ার মোড়লদের টেবিলে হওয়া উচিত। এই মানসিকতা আমাদের সমাজে নতুন নয়, কিন্তু এটি যতদিন প্রশ্রয় পাবে, ততদিন ভুক্তভোগী নারীরা আদালতের পথে একা হাঁটতে ভয় পাবেন।

এ ঘটনায় মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও জেলা পরিষদের প্রশাসক জাভেদ মাসুদ মিল্টন যথার্থই বলেছেন— সালিসের নামে মারধর ফৌজদারি অপরাধ। কিন্তু কথায় নয়, তাঁর এই বক্তব্যের প্রমাণ দিতে হবে কাজে। দলীয় ছত্রছায়ায় যারা আইনকে বুড়ো আঙুল দেখায়, তাদের বিরুদ্ধে দৃশ্যমান সাংগঠনিক ব্যবস্থা না নিলে এই কথা কেবল আনুষ্ঠানিকতাই

থাকবে।

এদিকে, পুলিশ অভিযোগ গ্রহণ করেছে, তদন্তের আশ্বাস দিয়েছে। এটুকু যথেষ্ট নয়। দ্রুত গ্রেপ্তার, সুষ্ঠু তদন্ত এবং আদালতে মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি নিশ্চিত করতে হবে। কারণ এই মামলার ফলাফল শুধু একজন নারীর ন্যায়বিচার নিশ্চিত করবে না— এটি সমাজকে একটি বার্তা দেবে যে বিচারপ্রার্থীকে থামানোর মূল্য দিতে হয়।

হাসপাতালের শয্যায় শুয়ে থাকা সেই নারী আমাদের বিচারব্যবস্থার প্রতি আস্থা রেখেছিলেন বলেই আদালতে যাচ্ছিলেন। রাষ্ট্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের দায়িত্ব সেই আস্থার প্রতিদান দেওয়া।

আইনের শাসন ও ক্ষমতার দাপট—একটি দৃষ্টান্তমূলক বিচার

মেহেরপুরের সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের ভাই এবং যুবলীগ নেতা শহীদ সরফরাজ মৃদুলের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোকের আদালতের নির্দেশ দেশের বিচার ব্যবস্থার প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা পুনর্গঠনে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ব্যবসায়ী অংশীদার দেবাশীষ কুমার বাগচির দায়ের করা এনআই এ্যাক্টের অধীনে ১ কোটি ৮০ লাখ টাকার চেক ডিজঅনার মামলাটি যেভাবে আইনি পরিণতির দিকে এগোচ্ছে, তা ক্ষমতার অপব্যবহারকারীদের জন্য একটি কড়া বার্তা।

মামলার বিবরণ অনুযায়ী, ২০২৪ সালে দায়ের করা এই মামলায় আদালত নিয়মমাফিক বিচারিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করেছেন। গত বছরের ২৩ ফেব্রুয়ারি আদালত যখন আসামিকে ১ কোটি ৮০ লাখ টাকার দ্বিগুণ জরিমানা অর্থাৎ ৩ কোটি ৬০ লাখ টাকা এবং এক বছরের কারাদণ্ড প্রদান করেন, তখন এটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে আইনের চোখে সবাই সমান। বিবাদী পক্ষ নির্ধারিত সময়ে আপিল না করায় সাজাটি চূড়ান্ত হয় এবং বর্তমানে ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা অনুযায়ী সম্পত্তি ক্রোকের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

অস্থাবর ও স্থাবর সম্পত্তির খতিয়ান আদালতের নির্দেশে আসামির ৩ কোটি ৬০ লাখ টাকা সমপরিমাণ সম্পদের তালিকা করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে মেহেরপুর ও হরিরামপুর মৌজার প্রায় ৩.৩৬ একর জমি এবং বিভিন্ন গৃহস্থালি সামগ্রী। এই বিশাল পরিমাণ স্থাবর সম্পত্তি ক্রোকের মাধ্যমে বাদি দেবাশীষ কুমার বাগচির পাওনা আদায়ের যে পথ প্রশস্ত হয়েছে, তা প্রশংসার দাবি রাখে। সাধারণত রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় থাকা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা করতে সাধারণ ব্যবসায়ীরা ভয় পান, কিন্তু এই মামলার অগ্রগতি প্রমাণ করে যে ধৈর্য ও আইনি লড়াই বৃথা যায় না।

জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদিও অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (এডিএম) জানিয়েছেন যে, জেলা প্রশাসকের বদলিজনিত কারণে কিছুটা বিলম্ব হয়েছে, তবুও আগামী সপ্তাহের মধ্যে আদেশ বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি আশাব্যঞ্জক। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে, “Justice delayed is justice denied”। ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের সম্পত্তি ক্রোকের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক দীর্ঘসূত্রতা অনেক সময় জনমনে সন্দেহের উদ্রেক করে। তাই মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উচিত হবে কোনো প্রকার চাপের মুখে না নতি স্বীকার করে আদালতের এই রায়টি দ্রুত কার্যকর করা।

দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে একটি নেতিবাচক ধারণা প্রতিষ্ঠিত ছিল যে, মন্ত্রীর আত্মীয় বা প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা হলে আইনের উর্ধ্বে থাকা যায়। কিন্তু শহীদ সরফরাজ মৃদুলের এই মামলাটি সেই মিথ ভেঙে দিচ্ছে। ক্ষমতার অপব্যবহার করে ব্যবসায়িক অংশীদারকে ঠকানো বা চেক জালিয়াতির মতো অপরাধ যে পার পায় না, তা এই রায়ের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছে।

দেবাশীষ কুমার বাগচির আইনি জয় কেবল এক ব্যক্তির জয় নয়, এটি সকল ভুক্তভোগী ব্যবসায়ীদের জন্য একটি অনুপ্রেরণা। মেহেরপুর জেলা প্রশাসন যদি আগামী সপ্তাহের মধ্যে সফলভাবে এই সম্পত্তি ক্রোক সম্পন্ন করতে পারে, তবে তা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় একটি মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হবে। আমরা আশা করি, বিচার বিভাগ এবং নির্বাহী বিভাগের সমন্বিত প্রচেষ্টায় সাধারণ মানুষ তাদের অধিকার ফিরে পাবে এবং সমাজ থেকে জালিয়াতি ও ক্ষমতার দাপট নির্মূল হবে। আইনের এই কঠোর প্রয়োগ যেন কেবল নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে না হয়ে সর্বস্তরে বজায় থাকে—এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

এ তরি বাইতেই হবে . . .

৯ বছরে পদার্পণ করলো আমাদের প্রিয় পত্রিকা মেহেরপুর প্রতিদিন। জেলা থেকে প্রকাশিত জনপ্রিয় দৈনিক। সীমান্তঘেষা ছোট্ট জেলা মেহেরপুর থেকে একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ অব্যাহত রাখা ‘নুন আনতে পান্তা ফুরোনো’ অবস্থা। যেখানে ছাপাখানা নেই, পত্রিকা মেকাপ করার মেকাপ ম্যান পাওয়া যায় না, প্রিন্ট করার জন্য যে ট্রেসিং পেপার ও কালি প্রয়োজন হয় সেগুলোও পাওয়া যায় না। এর বাইরেও পত্রিকার রসদ যোগানো বিজ্ঞাপনদাতা বা শিল্পপ্রতিষ্ঠানও নেই। কালেভদ্রে শুভেচ্ছা বিজ্ঞাপন পেতেও যে পরিমাণ বেগ পেতে হয়, তা আর নাই বললাম। অসংখ্য অসঙ্গতির মধ্যে দিয়ে একটি দৈনিকের ৮ বছর অতিক্রম করার ব্যাপারটি ছোট করে ভাবারও কিছু নেই। আমরা দলগতভাবে সেই ভাবনার কাজটি করে চলেছি।

মেহেরপুরে সংবাদপত্রের ইতিহাসে এত বছর ধরে কোন পত্রিকা প্রকাশ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি নানা কারণে। সকল প্রকার বাঁধাকে অতিক্রম করে মেহেরপুর প্রতিদিন ৮ বছর ধরে পাঠকের কাছে প্রতিদিন পৌছে দিয়েছে কড়কড়া পত্রিকা। সংগত কারণেই এ নিয়ে আমরা আনন্দিত, গর্বিত। মেহেরপুর প্রতিদিনকে আমরা পাঠকের মনের মনিকোঠায় নিতে পেরেছি। এই যাত্রায় আমাদের সঙ্গে আছেন অগণিত পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ী।

আপেল মাহমুদের গানের সেই লাইনগুলি মনে পড়ে বারবার।
জীবন কাটে যুদ্ধ করে
প্রাণের মায়া সাঙ্গ করে
জীবনের স্বাদ নাহি পাই
—

জানি শুধু চলতে হবে
এ তরী বাইতে হবে….।

পাঠকদের ভালোবাসা সঙ্গে নিয়ে এ তরি আমরা বাইতেই চাই। মেহেরপুরসহ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সর্বস্তরের মানুষের ভালোবাসা আমাদের প্রধান শক্তি। পাঠকসাধারণের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা রেখে পত্রিকাটি আমরা করোনার অতিমারিতেও প্রকাশ করে গেছি। জুলাই গণঅভুত্থ্যানের

সময় যখন সারাদেশে ইন্টারনেট সেবা অচল হয়ে গিয়েছিলো, সেসময়েও আমরা আমাদের প্রকাশনা অব্যহত রেখেছিলাম। আমরা বিশ্বাস করি, পাঠকই আমাদের সবচাইতে বড় শক্তি, বড় শ্রদ্ধার জায়গা। তাদের হাতে প্রতিদিন একটি গ্রহণযোগ্য পত্রিকা তুলে দেওয়ার চেষ্টা ৮বছর ধরে আমরা নিষ্ঠার সঙ্গে করে যাচ্ছি। আগামী দিনেও এই নিষ্ঠা দৃঢ়ভাবে বজায় রাখব।

জনগণের মুখপত্র` এই স্লোগানের স্বাক্ষর রেখে যা কিছু জনগণের জন্য কল্যাণ বয়ে আনে সেধরণের সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে আমাদের সহকর্মীরা নিরলস কাজ করছে।

সংবাদের ভিতরকার সকল সত্য প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি। অসততা আমাদের স্পর্শ করতে পারেনি। আমরা নিরপেক্ষ নই। আমরা মানুষের পক্ষে। প্রতিটি সাধারণ মানুষ, প্রতিটি সুবিধাবঞ্চিত মানুষের পক্ষে আমাদের কলম চলবে। মানুষই আমাদের মূলশক্তি।

২০১৮ সালের ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবসের দিন যাত্রা শুরু করেছিল মেহেরপুর প্রতিদিন। স্বাধীনতার এই মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ৯ মাসের যুদ্ধে আমরা পেয়েছি একটি স্বাধীন রাষ্ট্র।

শুধু পত্রিকা প্রকাশ করেই আমরা আমাদের দায়িত্ব শেষ করিনি। মাদকও অনলাইন জুয়ার ভয়াবহ কবল থেকে যুবসমাজ রক্ষার উদ্দেশ্যে আমরা মেহেরপুর প্রতিদিন ফুটবল টুর্নামেন্টেরও আয়োজন করেছিলাম। আয়োজন করা হয়েছিলো উদ্যোক্তা সম্মেলন ও চাকরি প্রার্থীদের চাকরি মেলা। পত্রিকার পাশাপাশি সমাজের বিভিন্ন সম্ভাবনা ও সমস্যা নিয়ে আমাদের প্রতি সপ্তাহে ধারাবাহিকভাবে লাইভ ‘টক শো’ অনুষ্ঠান চলমান রয়েছে। সবশেষে নতুন যুক্ত হয়েছে মাল্টিমিডিয়া ভার্সন। ভিডিও প্রতিবেদনের মাধ্যমেও দর্শকদের মাঝে এলাকার বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনা গল্প তুলে ধরছে আমাদের সহকর্মীরা।

পরিশেষে আমাদের পাঠক, শুভানুধ্যায়ী, লেখক, বিজ্ঞাপনদাতা ও মেহেরপুর প্রতিদিনকে যাঁরা ভালোবাসেন তাঁদের প্রত্যেককে শ্রদ্ধা, শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা।

লেখক: সম্পাদক, মেহেরপুর প্রতিদিন

সম্পাদকীয় ।। জাল সনদে বেতন নেওয়া শিক্ষকদের শাস্তির আওতায় আনতে হবে

শিক্ষা জাতীর মেরুদণ্ড, একটি জাতির ভিত্তি বলা হয়। শিক্ষকদের নৈতিকতা, সততা ও আদর্শই শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ গঠনের মূলে থাকে।

সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে মেহেরপুর সদর উপজেলার বর্শিবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকসহ পাঁচ শিক্ষক দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে জাল বিএড সনদ ব্যবহার করে অতিরিক্ত বেতন গ্রহণ করেছেন। এ খবর শুধু দুঃখজনকই নয়, বরং দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থা ও সম্মানকে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এবং একই সঙ্গে সরকারি টাকা আত্মসাতের মধ্যে ফৌজদারী অপরাধও বটে। যা চাকরিবিধির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

২০১৯ সালে বিদ্যালয়টি এমপিভুক্ত হওয়ার পর থেকেই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ব্যবহার করে জাল সনদ দেখিয়ে তারা উচ্চতর স্কেলে বেতন গ্রহণ করে আসছেন। অথচ বাস্তবে তারা বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের যশোর কেন্দ্র থেকে এখনো বিএড অধ্যয়নরত এবং মাত্র প্রথম সেমিস্টার শেষ করেছেন। এই তথ্য নিজেই প্রমাণ করে তারা সুস্পষ্ট প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে সরকারি তহবিল থেকে প্রায় ১২ থেকে ১৪ লাখ টাকা অতিরিক্ত অর্থ আত্মসাৎ করেছেন।

অধিকতর উদ্বেগজনক হলো, বিদ্যালয়ের আরেক সহকারী শিক্ষক আখি তারা খাতুন জাল সনদ দিয়ে চাকরি নেওয়ার অপরাধে জেল খেটে এসেছেন, তবুও হাজিরা ছাড়া তাকে বেতন প্রদান করা হয়েছে। প্রধান শিক্ষকের পদে থেকে এ ধরনের অনিয়মে সমর্থন দেওয়া কেবল নৈতিক অধঃপতন নয়, বরং প্রশাসনিক ক্ষমতার স্পষ্ট অপব্যবহার।

একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যখন শিক্ষকই অনিয়মের মাধ্যমে সুবিধা গ্রহণ করেন, তখন শিক্ষার্থীদের কাছে সততা ও নৈতিকতার যে শিক্ষাটি দেওয়ার কথা, তা ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, এই ধরনের ঘটনা দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর মানুষের আস্থা, নিয়োগ প্রক্রিয়ার

স্বচ্ছতা ও আর্থিক শৃঙ্খলা—সবই প্রশ্নবিদ্ধ করে।

ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার বক্তব্য অবশ্যই আশাব্যঞ্জক। তিনি বলেছেন, অভিযোগ প্রমাণিত হলে অতিরিক্ত বেতন সরকারি কোষাগারে ফেরত আনা হবে এবং আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে প্রশ্ন থেকে যায়—এই অনিয়ম পাঁচ বছর ধরে কীভাবে চললো? পর্যবেক্ষণ, অডিট ও তদারকি ব্যবস্থায় কি কোনো ঘাটতি ছিল? ইতিপূর্বে যারা সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন এমনকি শিক্ষা কর্মকর্তারা কি সঠিকভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করেননি এমন প্রশ্ন এখন ঘুরপাক খাচ্ছে। প্রধান শিক্ষকসহ ওই পাঁচ শিক্ষকের নিয়োগের ক্ষেত্রে যারা ভূমিকা পালন করেছেন তাদেরও এ জবাদদিহীতার মধ্যে আনতে হবে।

এই ঘটনার দ্রুত, নিরপেক্ষ ও কঠোর তদন্ত হওয়া জরুরি। কেবল অতিরিক্ত টাকা ফেরত আদায়ে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না; বরং এমন উদাহরণ তৈরি করতে হবে যাতে ভবিষ্যতে কোনো শিক্ষক বা প্রশাসনিক ব্যক্তি জাল সনদ বা প্রতারণার আশ্রয় নেওয়ার সাহস না পায়।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নৈতিকতার চর্চার জায়গা। এখানে ভুয়া সনদ, বেতন জালিয়াতি এবং কর্তৃপক্ষের গাফিলতি—সব মিলিয়ে যে অস্থির চিত্র ফুটে উঠেছে, তা এখনই সংশোধন না হলে দীর্ঘমেয়াদে ক্ষতিগ্রস্ত হবে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম।

গাংনীর বিএনপিতে অভ্যন্তরিণ দ্বন্দ্ব জনস্বার্থকে ছাপিয়ে যায়

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে আসন্ন সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি একটি গভীর সংকটের প্রতিচ্ছবি ।

দলীয় প্রার্থীর নাম ঘোষণার পর থেকেই গাংনীর রাজনৈতিক অঙ্গনে যে

পাল্টাপাল্টি কর্মসূচি চলমান, তা কেবল স্থানীয় উত্তেজনা বাড়াচ্ছে না, বরং বৃহত্তর গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পথেও বড় বাধা সৃষ্টি করছে। একদিকে মনোনীত প্রার্থীর ধানের শীষের জন্য ভোট প্রার্থনা, অন্যদিকে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে বিক্ষোভ—এই দুই বিপরীতমুখী স্রোত বিএনপির দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য এবং সংহতির ওপর একটি কঠিন প্রশ্নচিহ্ন এঁকে দিয়েছে।

রাজনৈতিক দলগুলিতে মনোনয়নকে কেন্দ্র করে অসন্তোষ নতুন নয়। তবে গাংনীর ঘটনা কেবল সাধারণ ক্ষোভের প্রকাশ নয়; এটি একটি সুসংগঠিত বিদ্রোহ। দলীয় হাইকমান্ড সাবেক এমপি আমজাদ হোসেনকে মনোনীত করার পরও, জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনের অনুসারীরা কঠোর অবস্থানে রয়েছেন। তাঁদের বিক্ষোভ মিছিল এবং মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবি স্পষ্ট করে যে স্থানীয় নেতৃত্বে আস্থার ঘাটতি রয়েছে, যা দলের তৃণমূলের ভিত্তিকে দুর্বল করে দিচ্ছে। একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনের ঠিক আগে এই ধরনের বিভেদ জনমনে ভুল বার্তা দিচ্ছে এবং দলের মূল আদর্শ থেকে মনোযোগ সরিয়ে দেয়।

দেখা যাচ্ছে, আমজাদ হোসেন তার নির্বাচনী প্রচারে দলের ঘোষিত ‘৩১ দফা কর্মসূচি’ এবং তারেক রহমানের বার্তা নিয়ে ভোটারদের দুয়ারে যাচ্ছেন। এটি নিঃসন্দেহে দলের একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ। কিন্তু যখন একই সময়ে দলের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে রাস্তায় বিক্ষোভ করে, তখন সেই ইতিবাচক প্রচেষ্টা ম্লান হয়ে যায়।

গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের মতো একটি মহৎ উদ্দেশ্য সফল করতে হলে প্রয়োজন ইস্পাত-কঠিন সংহতি। একটি শক্তিশালী জনমত গড়ে তোলার কথা ছিল, কিন্তু অভ্যন্তরীণ কোন্দল সেই মূল্যবান সময় এবং সুযোগের অপচয় করছে। সাধারণ ভোটারদের মনে এই প্রশ্ন জাগাচ্ছে যে, যে দল নিজেদের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখতে পারে না, তারা কীভাবে দেশের শাসনভার গ্রহণ করবে?

বিএনপি হাইকমান্ডের উচিত এই অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বকে হালকাভাবে না নিয়ে দ্রুত এর সমাধান করা। হয় মনোনীত প্রার্থীকে সব পক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে হবে, অথবা বিচক্ষণতার সঙ্গে এমন একটি সমাধান খুঁজতে হবে যা উভয় পক্ষের নেতৃত্বকে সন্তুষ্ট করে এবং সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করে নির্বাচনী মাঠে নামতে সাহায্য করে। দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্বকে স্মরণ রাখতে হবে যে, ব্যক্তির চেয়ে দল বড়, এবং দলের চেয়ে দেশের বৃহত্তর স্বার্থ সবার আগে।

গাংনীর চলমান পরিস্থিতি মেহেরপুর-২ আসনে বিএনপির নির্বাচনী সম্ভাবনাকে ঝুঁকিতে ফেলছে। ধানের শীষের পক্ষে যে গণজোয়ারের প্রত্যাশা করা হচ্ছে, তা কেবল তখনই সম্ভব যখন দল তার ভেতরের বিভেদ মিটিয়ে একটি একক ও শক্তিশালী ফ্রন্ট হিসেবে কাজ করবে। যদি এই দোটানা অব্যাহত থাকে, তবে তা শুধু একটি আসনের পরাজয় নয়, বরং বৃহত্তর গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পথেও একটি গভীর ক্ষত তৈরি করবে। সংহতি ফিরিয়ে আনাই এখন গাংনী বিএনপির জন্য একমাত্র অগ্নিপরীক্ষা।